অনিকেতন

আবদুর রউফ চৌধুরী

সপ্তম অধ্যায়

ঘুম থেকে উঠে কাজী পানি দিয়ে চোখমুখ ভিজিয়ে বাথরুম থেকে একটা তোয়েল হাতে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বসার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে; কখনও মুসলধারা, কখনও ঝিরঝির, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি। এখন চারতলা বাড়ির ব্যালকনির ওপর ঝাপসা আকাশটায় মেঘের ভারী পর্দা ঝুলছে।

কলিংবেলের শব্দ শুনে ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন কাজী। বদরুদ্দিন বাড়ির ভেতর এলেন। কাজী কি যেন ভাবছিলেন; হয়ত স্বপ্ন দেখছিলেন; দেখছিলেন বৃষ্টির মাঝে বাংলাদেশকে; বাদল দিনের স্মৃতি। আশ্চর্য হলেন যখন জানলেন ইমিগ্রেশন অফিসের প্রেরিত ফরম পূরণের কাজে বদরুদ্দিনের আগমন। বসার ঘরের একটা চেয়ারে বসতে না-বসতেই কাজী বললেন, আপনার মেয়ে কি নিজের ফর্মটা পূরণ করতে পারে না? ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া করা সত্ত্বেও।

– ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হয় এতে ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হয় না; যদি না নিজ গৃহে লেখাপড়ার সুব্যবস্থা থাকে। আমি এখন ছেলের বেলায় সতর্ক হয়েছি। মেয়ে বেলায় তেমন খেয়াল ছিল না। তবুও সে ইচ্ছে করলে ফর্মটা পূরণ করতে পারতো।

– ইচ্ছে কেন নেই?

– এ ফরমে যে ছেলেটার কথা উল্লেখ আছে ওকে স্বামীরূপে মেনে নিতে রাজি না।

– কেন?

একটু ইতস্তত করছেন বদরুদ্দিন। দ্বিধাগ্রস্তভাবে ঢোক গিলে বললেন, ছেলেটা এসেছিল দু-বছর আগে, ভ্রমণ বিসায়। ছ-মাস আমাদের সঙ্গে ছিল। মেলমেশার সুযোগ দেওয়া হয়। ইচ্ছে ছিল ছেলেটার ওপর নির্ভর করা সম্বন্ধে মেয়েটা নিশ্চিত হতে পারবে। কিন্তু ফল হল উল্টো, একেবারের বিপরীত। ছেলেটা আমার নিকট আত্মীয়; ওর বাবাকে কথাও দিয়েছি। আমি এখন সমস্যায় পড়েছি। শেষ পর্যন্ত মেয়েকে সবাই বুঝিয়ে এতটুকু রাজি করানো হয়েছে; ছেলেটার লন্ডন থাকার সুযোগ করে দিতে যতটুকু অভিনয়ের প্রয়োজন ততটুকু যেন করে। তারপর আক্ষেপ করে বললেন, এ-দেশে স্কুলপড়া মেয়েদের মনোভাব এরকমই হয়।

– একটু স্বাধীন চেতা হয় বই তো অন্য কিছু না। এতে এমন দূষণীয় কি!

– দেখুন কাজী সাব, পিতৃমনোনীত পাত্রকে অপছন্দ করার অর্থ নয় কি পিতাকে অস্বীকার করা। পিতার আকস্মিক আহতের আর্তনাদ যেন। এ নিশ্চয়ই পরিতাপের বিষয়, একটা শিক্ষিত সুশ্রী ছেলে যে পরিবার-পরিজন সকলের পছন্দ তার প্রতি বিরূপ মনোবৃত্তি সত্যিই বিষদৃশ্যবিষয়।

কাজী কিছু বললেন না।

বদরুদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার গলার স্বর ভারী করে বললেন, যার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে অকারণে আমার মুখটা করতে হচ্ছে হাঁড়ির মতো।

– খোঁজ করে বের যদি করতে পারতেন এর আসল কারণ, তাহলে প্রতিরোধ প্রয়োগ সহজে সম্ভব হত।

শূন্যপানে তাকিয়ে বদরুদ্দিন সিগারেট ধরালেন, ধূমপান যেন তার মনকে চাঙ্গা করার প্রধান উপকরণ। তারপর গলা পরিস্কার করে বললেন, ছোট একটা কথা, সামান্যকে উপলক্ষ করে আমার মেয়েটা তিলকে তাল করে নিজের মনে তৈরি করেছে এক চীনের প্রাচীর।

– ব্যাপারটা খোলে বলুন।

– কী আর বলবো। বাংলাদেশ থেকে আগত একটা ছেলের মনে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক না, যখন সে দেখল তারই বাগদত্তা স্ত্রী রাস্তার পাশে আরেকটা ছেলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রসালাপে রত। এ নিয়ে সে যে-ই না প্রশ্ন করল অমনি বেঁকে বসল আমার মেয়ে। মেয়েরা বাঁকা-হাড় দিয়ে তৈরি কি না! এ আমি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

বদরুদ্দিন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, মুখে কষ্টের রেখাগুলো সহজেই ভেসে উঠল। বললেন, বাথরুম থেকে ফিরে এসে বলবো বাকি কাহিনী। পা টিপে টিপে যেতে যেতে আবার দাঁড়ালেন, বললেন, বহুমূত্র রোগী কি না...।

বাকি কথা ভেসে গেল কোরিডোরের বাতাসে, বোঝা গেল না, ডুবে গেলে দরজার অন্তরালে।

বদরুদ্দিন বাথরুমের দরজা ঠাস করে বন্ধ করলেন। আর তখনই কাজীর মাথার মধ্যে একটা ঘটনা এসে ধাক্কা খেল। অন্তর সরোবরে ভেসে উঠল, শাপলার মতো স্পষ্ট, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি এলাকার এক পাঠানের কথা। কাজী বসার ঘরের আরাম কেদায় হেলান দিয়ে পরিচিত সে দৃশ্যটা মনে করতে থাকেন।

কোহাট ও পেশোয়ারের মধ্যপর্তী এলাকায় এ উপজাতির বাস। তারা মুখে স্বীকার করে শুধু পাকিস্তান, প্রতিদানে পাকিস্তান মেনে নিয়েছে তাদের স্বতন্ত্র শাসন। ভিন্ন আইন কাকুন। এমনকি দোকানে দোকানে সারি সারি স্বহস্তে তৈরি রাইফেল রিভলবার সাজানো থাকে। বাংলাদেশে যেমন বুড়োরা বৈকালিক ভ্রমণে লাঠির সাহায্য নেন, তেমনি নেন পশ্চিমা লোকজন নেন কুকুরের আর তেমনি এ উপজাতির জীবনসাথী হচ্ছে একটা– বন্দুক। সমর্থ সবাইর কাঁধে ঝোলানো থাকে একটা বন্দুক।

একদিন এক পাঠান উপজাতি বাজার থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মাটির দেয়াল ঘেরা ফটকের ফাঁকে তার দৃষ্টি গোচর হল এক নারী মূর্তির উপর। সে রান্না ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো। পাশে একটা ছায়া মূর্তি। ছায়া মূর্তিটা কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তন্দুরি চুলার আগুনের আভায় স্পষ্টতর হতে থাকে চেহারা দুটো। নারী মূর্তিটা তার স্ত্রীর। ছায়া মূর্তিটা তার ভাতিজা, আল্লাদিত্তা খান। হাসির রেশ লেগে আছে স্ত্রীর সারা মুখে, তার হাসির স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে পাঠানের সারা গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। বন্দুকে গুলি ভরল। আঙুল ট্রিগারে। ভূমিকম্প অনুভূত। ভয়াবহ কিয়ামত। আবার সেই হাস্য কলরোল। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা পেঁচা, বিদ্রূপের ধ্বনি ছড়িয়ে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যার ভরাট চাঁদটা খন্ড খন্ড হয়ে খসে পড়ে পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। সীতার মরণ চিতা যেন। ট্রিগারে আঙুল ধনুকের মতো বক্রাকার ধারণ করল। শব্দ হল। গুড়ুম, গুড়ুম। পাঠান বধুর দেহটা ধরাশায়ী, নিস্তেজ, বারেক স্পন্দন, তারপর স্তব্ধ, নীরব, শেষ।

কাজী ভেবে চললেন, এ পাঠানের সঙ্গে বদরুদ্দিনের বর্ণিত তার আত্মীয়-নন্দিত তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি যুবকের চরিত্রের আদিতে আদৌ কোনো ব্যবধান নেই। শুধু সামাজিক পরিবেশে বৈষম্যতা আছে, মাত্রাজ্ঞানের তারতম্য মাত্র।

বদরুদ্দিন ফিরে এলেন, কপাল কুঞ্চিত। কাজী গভীর, গম্বীর। বদরুদ্দিন কি যেন ভেবে নিয়ে চেয়ার টানলেন। কাজী মুখ তুলে তাকালেন। বদরুদ্দিন চেয়ারে উপবেশন করতে করতে বললেন, ছেলেটা তো জানতো না যে, আমার মেয়ে বহুদিন পর রাস্তায় দেখা তার সহপাঠির সঙ্গে সদালাপে ব্যস্ত ছিল।

কাজী ভাবলেন, নৃশংস পাঠানও তো অজ্ঞাত ছিল ভ্রাতুস্পুত্রের সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্কটা নিয়ে, যা ছিল অনাবিল মাতৃরূপের প্রকাশ, এ অবশ্যই বাঁকা হাড়ের বিড়ম্বনা না। পুরুষ সংকীর্ণ মনের নিছক নিষ্ঠুরতা মাত্র।

বদরুদ্দিনের ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। তার আগের কথার জের টেনে কাজী বললেন, ভাবী স্বামীর পাঁজর দিয়ে যদি হবু স্ত্রীকে তৈরি করা হয়, তবে এ ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের নিবিড় সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠবে। কাজেই আপনার মেয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত।

– আপনার কী তা-ই বিশ্বাস!

– স্বকীয় স্বার্থে পুরুষের তৈরি এ-ধরনের কাহিনী বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে টিকে না, এ নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া যায় না; তবে এ কথা স্বীকার্য যে, ধর্মের ব্যাপারে মানুষ যুক্তির দ্বারা না, বরং বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। পরীক্ষা-পর্যবেক্ষর্ণের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায়; কিন্ত দুর্বল মনের মানুষ চায় ধর্মকে অবলম্বন করে। ধর্ম অক্ষমের সান্ত্বনা বলেই প্রতীয়মান, পারলৌকিক সত্য, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শতাব্দীর জঞ্জালে আবৃত। এ উদ্‌ঘাটন করা সহজ না; আর সাধারণের প্রয়োজনেও লাগে না। সযত্নে কুরআন শরীফ সিকেয় তোলে রাখার মতো। কুরআনকে শুধু ভক্তি করে সিকেয় তুলে যত্ন করে, কিন্তু এর মধ্যে কি লেখা আছে তা জানার আগ্রহ রাখে না; তাই বোধ হয় জৈন সাধুরা বলেছেন, আধ্যাত্মিক নিয়ে আদার বেপারীর ঘাটাঘাটি শোভা পায় না।

বদরুদ্দিনের হাঁটু কেঁপে উঠল। দুঃখে না রাগে, কে জানে! দীর্ঘশ্বাস নেওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, তাদের কথায় আমরা মুসলমানদের কি আসে যায়? আমাদের অলী দরবেশ যা বলেছেন তাই শুধু আমরা মানবো।

কাজী স্থির দৃষ্টিতে বদরুদ্দিনকে দেখে নিয়ে বললেন, বিখ্যাত সুফী সাধক ও কবি মাওলানা জালাল উদদীন রুমী বলেছেন, It was even He that cried in human shape, 'Anal Haq', the one who mounted the scaffold was not Mansur as the foolish imagined. এ কথার অর্থ কী? জগতের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের মূলে কি কোনো ঐশীশক্তিকে স্বীকার করেছেন? স্রষ্টার অস্তিত্ব কী সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেননি? প্রগতিশীল মানুষ প্রচলিত ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে অস্পষ্ট ও অযৌক্তিক বলে বাতিল করে দেয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই সমস্ত কিছু বিচার-বিশ্লেষণের একমাত্র প্রকৃত মানদণ্ড বলে প্রগতিশীল মানুষ মনে করে। তারপর শুনুন, তিনি আরও কী বলেছেন, Until at last He appeared in the form of an Arab and gained the empire of the world. তারপর বদরুদ্দিনকে স্বাভাবিক করার জন্য বললেন, এ-কথাগুলোকে বঙ্গানুবাদ করতেও ভয় পাই। মারিফতের মারপ্যাঁচ আছে কিনা! আপনার বিবেচনায় তাই ছেড়ে দিলাম। আমার জন্যে শরিয়তের সহজসরল মধ্যপন্থা পালনই যথেষ্ট।

কাজীর কথায় বদরুদ্দিনের চিড়ে ভিজেছে বলে মনে হচ্ছে না। হয়ত-বা কাজীর কথা তার কানেই প্রবেশ করেনি; অন্য চিন্তায় বিভোর তাই। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে বদরুদ্দিনের চিন্তাধারা চলে গেল শূন্যে। সঙ্গতিহীন। বললেন, পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা স্বাভাবিক মেয়েলীলাজনম্য প্রভাবকে নষ্ট করে দেয়। ইসলামে তাই পর্দাপ্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে, নারীর দুর্বল দেহমনকে বহির্বিশ্বের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

এ-সময় কাজী আর কোনো দিকে তাকাতে পারছেন না; তবুও একবার হাত-ঘড়ি দেখে নিলেন। সকালে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ভাবছিলেন বাংলাদেশের কথা, ইলিশের কথা। ভাবছিলেন বাঙালি দোকানে ছেলেকে পাঠিয়ে ইলিশ আনাবেন; কিন্তু এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। চারিদিক খটখটে, ইলিশ ভাজা খেতে তেমন জমবে না। বদরুদ্দিন বলে চললেন, আমি যখন অধুনালুপ্ত মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন পণ্ডিত মশায় বলেছিলেন রবি ঠাকুর নাকি লিখেছেন কোনো এক জায়গায় যে, প্রাচ্যের নারী ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আব্ধ

থাকলেও সে গৃহিনী, সংসারের কর্ত্রী, আঁচলে বেঁধে রাখে চাবিগুচ্ছ– সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের ও তার কর্তৃত্বের পরিচায়ক হিসেবে। সত্যিই আমাদের পর্দাপ্রাথর যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করে বিলেতি উচ্ছৃঙ্খলতা?

– প্রথম আমার জানা নেই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন উদ্দেশে, কোন পরিবেশে একথা বলেছিলেন। আপনি কি তার সঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারবেন?

বদরুদ্দিন মাথা নাড়লেন। বললেন, না। একটা নিস্তব্ধতার ছায়া নেমে এল তার চোখেমুখে, বিবর্ণ রক্তহীন মুখ, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। স্থিরনিশ্চল বসে আছেন কাজীর সামনে। কাজী বললেন, তাহলে এর আদ্যোপান্ত না জেনে বক্তব্যের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে গ্যাটে, দান্তে, শেক্সপীয়ার, রবি ঠাকুরের মতো মহাকবিদের উক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার করা অসমচীন। আমার জানা মতে, বিশ্বকবি নারীকে 'মাতা' ও 'প্রিয়া' এই দুই জাতের বলে মনে করতেন। 'মাতা' রূপটা হচ্ছে, 'জলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভবিয়ে দেন অভাব।' যেন বর্ষা-ঋতু। আর 'প্রিয়া' রূপটা হচ্ছে, 'গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়াতন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মনিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবের ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে-ঝঙ্কারে বেজে ওঠে সর্ব দেহমনে অনির্বচনীয় বাণী।' যেন বসন্ত-ঋতু। আপনি যা বললেন এখানে হয়ত বিশ্বকবি, চাবিগুচ্ছে শোভিত আঁচল বিশিষ্ট শাড়ি পরিহিতা প্রগতিশীল পরিবারের এক হিন্দু গৃহিনীকে বোঝাছেন। কলকাতাবাসিনী এক ব্রাহ্মরমণীর ছবি এঁকেছিলেন সুনিপুণ কলাকৌশলে; নারীর অনবদ্য সৌন্দর্যে পুরুষমাত্র মুগ্ধ হয়। তিনি অবশ্য পাড়া-গাঁয়ের মুসলিম পরিবারের নিগৃহীত নারীর লাঞ্ছিতরূপ অবলোকন করার অবসর পাননি। অবশ্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো তিনিও মুসলমানকে বাঙালি বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই পর্দাপ্রথার ধারণাটা কোথায় থেকে আসে, দেখছি না।

– শরৎচন্দ্রকে তো সদাশয় সাহিত্যিক বলে জানতাম। বিস্ময় প্রকাশ করলেন বদরুদ্দিন।

– অবশ্য বঙ্কিম চন্দ্রের মতো তিনি ঘোর মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না; যদিও মুসলমান 'গহর'কে গরুর সঙ্গে তুলনা করতে ভুলেননি। সেসময় বঙ্কিমের মুসলিমবিদ্বেষ সঞ্চারিত, সংক্রামিত হয়েছিল হিন্দু বুদ্ধিজীবিমহলে; এমনকি ঠাকুর পরিবারেও বঙ্কিম প্রভাবান্বিত লোকের অভাব ছিল না। আজ বেঁচে থাকলে শরৎ বাবুকে পাল্টিয়ে লিখতে হত শ্রীকান্তের সেই অধ্যায়; আর বঙ্কিম চন্দ্র করজোড়ে ক্ষমা চাইতেন তার অসত্য উক্তির জন্য; কারণ, এ তাকথিত 'অবাঙালি, যবন, ম্লেচ্ছ' মুসলমান আজ বাংলাভাষার ধারক ও বাহক।

– সত্যিই-তো, বর্ণহিন্দু প্রায় সবাই চলে গেছে হিন্দুস্থানে, রামরাজত্বে, হিন্দিভাষীর পদানত হওয়ার জন্য।

– হ্যাঁ, সাহিত্যসম্রাট ও কথাশিল্পী যাদের বাঙালি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তারা আজ বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ করার পাপে পর্যুদস্ত হয়ে পরিচয় হারানোর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত এবং বাংলাভাষাকে যে-হিন্দিভাষা কোণঠাসা করছে তাকে অর্ঘ্যদানে ব্যস্ত। শিখ ও শিবাজীর অধঃপুরুষের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে তসলিমের সঙ্গে তথাস্তু; খণ্ডিত বঙ্গমাতাকে 'বন্দে মাতরম'।

– বাংলাদেশের আদি অধিবাসী তো এ বঙ্কিম চন্দ্রের পূর্বপুরুষ!

– না, এ ঠিক না। তাহলে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি ফেলতে হয়। দ্রাবিড়, শক, হুন, সাঁওতাল, ভীল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের বিভিন্ন জাতি উপজাতি মিলে গড়ে উঠেছে বর্তমান বাঙালি জাতি। এই পলিমাটিতে একসময় অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়ের বাস ছিল। ওরা শিকারী, আদিমপ্রথায় কৃষিকাজ করতে জানত। ভেড্ডাপ্রতিম মানুষরা এদেশের প্রকৃত আধিবাসী, এদের গায়ের রঙ ছিল কালো ও দেখতে বেঁটে আকৃতির; এদের পূর্বপুরুষরা একসময় পাহাড়ে বাস করত, পরে সমতলভূমিতে বাসবাস শুরু করে। সিন্ধি, গুজরাটি, মাদ্রাজী ও বাঙালি আর্যপূর্ব সুসভ্য দ্রাবিড় জাতি। এদের ঐতিহ্যপূর্ণ কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি ছিল সিন্ধুনদ ও ব্রহ্মপুত্রনদের অববাহিকা। তিব্বতী ভাষা জলাভূমি বা 'বং' এ থেকে বঙ্গের উৎপত্তি। আর্যপূর্ব সভ্যজাতি হচ্ছে বাংলার আদি অধিবাসী। বাংলার বদ্বীপ অঞ্চল সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, তাই আর্যবাসী উত্তরাঞ্চলের প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এ-অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে।

বদরুদ্দিন সমস্ত শরীর নাচিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আবার। ঘরের বাতাসে সুগন্ধি জর্দারগন্ধ ছড়িয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। ফিরে এসে শব্দ করে বসতেই কাজী দেখলেন তার সমস্ত শরীরের, রেখায় রেখায়, একটা অপূর্ব ছবির ছাপ লেগে আছে। মুখের প্রতিটা ভাঁজে ভাঁজে যেন আনন্দহিল্লোল। কাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, থামবেন না, থামবেন না। বলুন, বলুন।

সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ। সব শব্দ যেন লজ্জায় থেমে গেছে। কাজী বলে চললেন, একসময় বাংলাদেশের আদিবাসীর অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়। বাংলার মানুষ সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে, সমস্ত বিঘ্নকে অতিক্রম করে বৌদ্ধ-বেদীতে নিজেকে নিবেদন করে মানবতার অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলে। জাতির কল্যাণের জন্য বাংলার মানুষ নিজেকে করেছে বৌদ্ধধর্মে সমর্পণ। বৌদ্ধ-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে বিদেশী বৈদিক হিন্দু শাসকের, বিশেষত সেন রাজাদের, অত্যাচারে অনেকে বাঙালি, আর্য-হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সরলচেতা বাঙালির এক অংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। তাই বর্তমানে বাংলার মুসলমানরাও আদি অধিবাসীর অধঃস্তনপুরুষ। দীর্ঘকাল আর্যজাতির আধিপত্যে ও অত্যাচারে আদিজনপদ আর্যভাষা ও আর্য-হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আদিবাসীর সভ্যতা এমনকি সত্তা ক্রমশ বিলোপ হতে থাকে ব্রাহ্মণ্যবাদের নাগপাশে। আর্য-হিন্দুরা শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করে আমাদের দেশে। সভ্যতার দাবিদার এ-জাতি মানুষে মানুষে বিভেদ রচনা করে, তাঁবেদারপ্রথার প্রচলন করে, নতমস্তকে নতিস্বীকারে প্রণাম পাওয়ার প্রবণতা শিখায়। পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাকে স্থায়ী করার জন্য চীনের প্রাচীর নির্মাণ করে বলবৎ করেছে জাতিভেদ প্রথাকে। ব্রাহ্মণ ও তার অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় প্রায় সবাই বিদেশাগত; উড়ে এসে জুড়ে বসল বাংলায়, বৈদিক হিন্দু সমাজের পুরোধা হয়ে। তাই তো তাদের বলি, আদি বাঙালিত্ব দাবি করলে ব্রাহ্মণত্ব বাপু যাবে গোছে। ব্রাহ্মণরা তো আর্য এবং ব্রাহ্মণ, ওরা আর্য হয়ে আদি বাঙালি হয় কিভাবে!

বদরুদ্দিন কি যেন কি ভেবে বললেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে ওপারের বাঙালিকে আবার বাঙালি হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

– এ তো সহজসাধ্য না। ঘরের একটা ছাগল পালিয়ে গেলে তাকে ধরে আনতেও সময় লাগে, সুযোগ লাগে। দেখছেন না, বেহুদা খালিস্তান দাবিদার শিখগোষ্ঠীকে দফারফা করছে হিন্দুস্থান সরকার। ঠিক তেমনি করছে কাশ্মিরির বেলায়ও। ১৯৪৭ সালে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় যদি শিখ বা কাশ্মিরি সজাগ থাকত তবে আজ তাদের রক্তক্ষয়ীসংগ্রমে লিপ্ত হতে হত না। কোনো চালু ব্যবস্থার পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন, কষ্টকর। কাজীর বুকে একটা অসহ্য কথা গুমরে উঠল। বদরুদ্দিনের মুখের দিকে তাকালেন। সচেতন হয়ে দেখলেন। বললেন, যেমন আপনার বর্ণিত বোরকাপ্রথার ঘানি আমরা টেনে চলছি, শিকল সরাতে পারছি না।

– এতো আল্লাহর আদেশ।

– না বদরুদ্দিন সাব। এ ইসলামিক তো নয়ই, আরাবিকও না। বদরুদ্দিন কিছু বললেন না। কাজী জানেন ধর্মের বিপক্ষে কিছু বললে তিনি কি রকম অস্বস্তি বোধ করেন। আর কাজীও চান না নিজের সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে। তিনি বলে চললেন, খোলাকায়ে রাশেদীনের পর ইসলামের আদর্শের অবনতি হওয়ার ফলে অন্যান্য কৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মুসলমান গ্রহণ করেছিল পারস্যের যরাষ্ট্রিয়ান ও খ্রিশ্চিয়ান সিরিয়ানদের বাহ্যারম্ভর প্রদর্শনীয় বোরকারূপ আবরণটাকে; যা সঙ্গতি সম্পন্ন অমুসলমান স্ত্রী-কন্যার আকৃষ্টতর করার অভিলাসে ব্যবহার করা হত; যেমন এককালে চীনদেশে মেয়েদের লৌহপাদুকা পরানো হত, সুন্দরী সাব্যস্ত করার জন্যে। দেশকাল ভেদে সৌন্দর্যের রকমফের। পুরুষের মর্জিমাফিক। সমাজে আধিপত্য পুরুষেরই। পুরুষই স্বামী, পুরুষও রাজা। এ সমাজ পুরুষশাসিত। তাই পুরুষের হুকুমই আইন, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক। তেমনি প্রকাশের প্রকার ভেদে পুরুষের সেচ্ছাচারী চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে নারী।

বদরুদ্দিন ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। তার মুখ দেখে কাজী বুঝলেন, স্বাভাবিক দেখাচ্ছে; অস্বাভাবিক শুধু তার পোশাকপরিচ্ছদে। এমন গরম-করে-রাখা ঘরে তিনি একটা ফুলহাতা উলের জাম্পার পরে আছেন; ইচ্ছে করলে ওটা খুলে পারতেন। পায়ের কাছে চোখ যেতেই কাজী দেখলেন, দুটো পায়ে দু-রঙের মোজা; একটা গাঢ় কালো অপরটা ছাইরঙ। হেসে ফেললেন। বললেন, আপনি তো জানেন মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রেখে মুসলিম

নারীকে বাইরে বেরানো অনুমতি আছে ইসলামে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের লজ্জা ঢাকা ও শোভার জন্যে পরিচ্ছদ প্রেরণ করেছি, বস্তুত সংযমের পরিচ্ছদই অতি উত্তম।

– অমার্জিত রুচির পুরুষের লোলুপদৃষ্টি থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য বোরকা বেশ উপকারী। বললেন বদরুদ্দিন। আর তার অন্তরে ঘুমন্ত কিছু স্মৃতি খুঁজে খুঁজে চোখের পর্দায় তুলে আনতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, এসব কথা এখন আমার কেনই-বা মনে পড়ছে। প্রকাশ্যে বললেন, এমনি ধরনের এক গল্প শুনবেন! আমার এক পাকিস্তানি বন্ধুর কাছে থেকে শোনা গল্প।

– বলুন, তবে একটু থামুন। আমি রান্নাঘর হয়ে আসি।

কাজী রান্নাঘরে গেলেন। ধীরে ধীরে রান্নাঘর থেকে আবার বেরিয়েও এলেন। এর মধ্যে বদরুদ্দিন গল্পটা তৈরি করে নিলেন। কমলারস ভর্তি একটা গ্লাস এগিয়ে দিলেন। কাজী নিজে অপর গ্লাসটা তুলে নিলেন। বদরুদ্দিন গলা ভিজিয়ে শুরু করলেন, তবে শুনুন...এক পাঠান একই সিনেমা হলে প্রতিদিন যায়, একই ছবি দেখতে, তা লক্ষ্য করে এক পঞ্চনদ অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসী পাঞ্জাবি এই পাঠানকে জিজ্ঞেস করল, 'হে ভাই, তুমি রোজ একই ছবি দেখতে যাও কেন?' উত্তরে হিন্দুকুশের পাদদেশবাসী বলল, 'কে বলেছে?' পাঞ্জাবি বলল, 'কেন আমি নিজেই তো দেখেছি গত তিন সপ্তাহ ধরে একই ছবি দেখতে তুমি যাচ্ছো। একদিনও বাদ দাওনি।' মুখে ছাই মেখে পস্তুভাষী মস্তান বলল, 'পস্তানায় পড়েছি। ভেবেছিলাম একদিন না-একদিন ট্রেন লেট হবে। শেষে বুঝলাম মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না।' পাশে দাঁড়ানো বাঙালি শ্রোতাকে পাঠানের এই কথার তাৎপর্য বোঝানোর পারদর্শিতা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হল পাঞ্জাবি। পরের ত্রুটি প্রকাশে সফলতার মধ্যে নিজের দোষ ঢেকে নেওয়া যেন। পাঞ্জাবি বর্ণনা করল সেই সিনেমার দৃশ্য। লাহোরের দুর্বিষহ গরমে ঘর্মাক্ত কলেবরে নায়িকা নাইতে আসে নলকাতে জৈন ধর্মের দিগম্বর সম্প্রদায়ের অনুকরণে। প্রবৃত্ত প্রকৃতির দুলালী দর্শনেচ্ছুক চারিদিকে আঁখির ঝাঁক, যেন গুড়ের টিনে পিঁপড়ার দল। শত চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে যখন ছটফট দর্শককূল, ঠিক সে-মুহূর্তে মর্তলোক ভেদ করে একটা ট্রেন এসে নিবাবরণ নায়িকাকে আবৃত করে ফেলে, কৃষ্ণের প্রদত্ত দ্রৌপদীর শাড়ির মতো। তবে ড্রাইভার বা দৈব্যের দোষে ট্রেনটা একবার লেট করলেই অভিষ্ট সিদ্ধি। তাই তো পাঠানের এ নিয়মিত তীর্থ যাত্রা। টিপ্পনি কেটে শ্রোতা বাঙালি তার পাঞ্জাবি বন্ধুকে বলল, 'তার রোজকার এ অভিসারের তুমিই একমাত্র সাক্ষী! অর্থাৎ তুমিও ভাইয়া তার গোড়া রোগে ভোগছো।' একথা শোনে পাঞ্জাবি সালাম জানিয়ে বিদায় নেয়। আর বিড়বিড় করে বলে গেল, 'বাঙ্গালকা আদমী যাদু জানে।'

গল্প শুনে কাজী বললেন, দেখলেন তো বদরুদ্দিন সাব পর্দাপ্রথা এ পাঠানের প্রবৃত্তির পরিবর্তন আনতে পারেনি। বদরুদ্দিন কোনো কথা বললেন না। কাজী বলে চললেন, এমনকি নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি কোরআনের যে নির্দেশ, আঁখি অবনত করো, তা মানতে তার মন সায় দিল না। করল না কোনো সাহায্য। কারণ, মনকে তজ্জন্য প্রস্তুত করা হয়নি। সুচিন্তা, বাস্তব চিন্তা দিয়ে মনকে সমৃদ্ধ করা হয়নি। মজবুত করা হয়নি প্রতিকূল প্রবৃত্তির প্রতারণায় প্রলুব্ধ না হওয়ার জন্যে।

কাজী-গিন্নির জুতোর আওয়াজ তার কানে এল। এ শব্দটা কাজীর চেনা হয়ে গেছে। সারা সকাল বদরুদ্দিনের সঙ্গে থেকে থেকে এ শব্দের জন্যেই তো অপেক্ষা করছেন। বাথরুমের দরজা বন্ধ হতেই কাজী আবার শুরু করলেন, আসল পর্দা হচ্ছে রিপুকে জয় করে চরিত্র গঠন; যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রযোজ্য। নারীকে গৃহে আবদ্ধ রেখে বা বোরকা দিয়ে বস্তাবন্দী করে সমস্যার সমাধান হয় না। হতে পারে না। শয়তানের চেয়ে শক্তিশালী হতে হবে মানবমন। শক্ত প্রস্থরখণ্ড ঝড়-বৃষ্টির দাপটে মাটির ঢিলার মতো ক্ষয়প্রাপ্ত যেন না হয়; বরং যেন তার চাকচিক্য বাড়ে। বিরাট বৃক্ষে বর্ধিত ও শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় বটচারাকে টুকরি দিয়ে ঢেকে রাখলে কি হবে তা পরিণতি? একবার ভেবে দেখুন! কারও মেয়ে অবরোধের অত্যাচারে পঙ্গু না হয়ে মুক্ত আলোবাতাসে বিকশিত হওয়ার সুযোগ যদি পায়, তবে সে অধ্যাপিকা হতে কতক্ষণ; আর হতে পারলে তার জীবন-ইতিহাসের অধ্যায়গুলো অন্যভাবে লিখা হবে। আর তখনই এ-হবে তার তাকদীরের লিখন। সেদিন আপনার কথায় সায় দিয়েছিলাম সর্বসমক্ষে বিতর্ক বর্জনীয় বিধায়। আজ আমার অভিমতের স্পষ্ট প্রকাশ আপনার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরীকরণে সহায়ক হলে তৃপ্তি পাবো।

– তবে কি ইসলাম রক্ষণশীল ধর্ম বলে বিবেচিত হবে?

– নিশ্চয়ই না। আমি এখানে ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলছি না। ইসলাম-ধর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা আর বাস্তবে আরবের জাহেলীযুগে ইসলাম-বিপ্লব করা একেবারেই আলাদা জিনিস। এ পদ্ধতি এনেছিল আর্থ-সামাজিক বিপ্লব, শিশুকন্যা হত্যা রদ করতে রুখে দাঁড়ানো, নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির অংশ দেওয়া, স্বামীর সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া, গৃহাঙ্গন থেকে রনাঙ্গন পর্যন্ত– সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পাওয়া– এসব। পুরুষের সঙ্গে একাত্বভাবে চলার সুযোগ নারীকে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, অধিকার চিহ্নিত করেছিল, সর্বপ্রকার কাজে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; এমনকি সালাতেও। এমনকি নারী-পুরুষের সমস্যার গভীরে গিয়ে খোঁজ করতে বলেছে। পুংখানুপুংখভাবে সমস্যার তথ্যানুসন্ধান করলে যে তার সমাধান করার উপায় থাকে তাই ভুলে গেছে ইসলামের মানুষ।

– আলাপালোচনায় বেশ সান্ত্বনা পেলাম। আমার মেয়েকে বাধ্য করবো না কোনো কিছু ওর মতের বিরুদ্ধে করতে। ছেলেটার সঙ্গে মনের মিল না হলে পৃথকপথ বেছে নিতে সাহায্য করবো।

বাথরুমের কাজ সেড়ে কাজী-গিন্নি বেডরুমে ঢুকে গেলেন আবার। কাজী বিভ্রান্তের মতো তাকালেন দরজার দিকে। তারপর সহজ পরিবেশে মিনিট কয়েকের জন্য তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ঈদ-অনুষ্ঠান-উদযাপন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করলেন। কথা প্রসঙ্গে বদরুদ্দিন বললেন, আগামী মাসে মুসলিম সোসাইটির অনুষ্ঠিতব্য ইলেকশনে আমাদের সেক্রেটারি হোসেনসাব চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। উদ্দেশ্য, একই সঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদ কুক্ষিগত করে নিজের কুমতলব হাসিল করা।

– মানে?

কালো কপাল কুঞ্চিত করে বদরুদ্দিন উত্তর দিলেন, অর্থাৎ, কালক্রমে বটবৃক্ষের আলিঙ্গনে পাশে ঘেঁষা জারুলগাছটার অস্তিত্বলোপ করা আর কি!

অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন চেয়ারের হাতলে আলতোভাবে রাখা ডান-হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠল। মুষ্টিবদ্ধ আঁকার ধারণ করল, মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলীর হাতের মতো। চোখ দুটো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কঠিন স্ফুলিঙ্গ বিকিরণ যেন। বদরুদ্দিন বললেন, কখ্খনো না। দু-দুবার বঞ্চিত হয়েছি, আর না। এবার প্রতিষ্ঠা চাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বন্দ্ব লাগে, সংঘর্ষ বাধে, তবুও সংগ্রাম করবো। আমাদের কষ্টার্জিত সফলতা, দুধ-কলা দিয়ে থালায় তোলে দানবের পূজোয় দান করবো না।

বদরুদ্দিনের উত্তেজনা কমানোর জন্য চেয়ারম্যান বললেন, উপস্থিতিতে লগ্ন চিন্তা, যা ঘটেনি তা নিয়ে অযথা ভেবে সারা হওয়ার কোনো কারণ নেই।

একটুও দম না নিয়ে বদরুদ্দিন বললেন, আগে হাঁটলে চোরেও পথ পায়। ডাকের বচন বৃথা না। চেয়ারম্যান সাব, সরলতা ও আন্তরিকতা দ্বারা পরিচালিত সৎমানুষ সর্বক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে না, কুটিল সমস্যা সংকুল সমাজে, বরং প্রতারিত হয়, ঈপ্সিত আদর্শ স্থাপনে ব্যর্থ হয়। তখন ব্যথিত অন্তরে দিশেহারা হয়ে কালাতিপাত করতে বাধ্য হয়। আমি দীর্ঘদিন এ-ধরনের মানুষের সঙ্গে কাজ করে, এ অঞ্চলে বসবাস করে যে-তিক্ত-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা আপনাকে তো কোনোদিন স্পর্শ করেনি। আপনি এসব ঝামেলার বাইরে, দূরে বাস করছেন, আপনাকে তো সবকিছু জানতে দেই না; আবার যদি আপনি সরে দাঁড়ান। তাই আপনি এসব জানেন না।

– আমি যেভাবে জড়িয়ে পড়েছি, সহজে কি সরে যেতে পারি!

– আপনাকে আমরা হারাতে পরি না। আপনি যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের মেরুদন্ড। তাই আপনাকে দূরে রেখে আমরা আদর্শরূপে ব্যবহার করে চাই প্রতিষ্ঠা লাভ। যাক, আপনি ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা নেবো। শাকরেদকে শাসন করবো। তবু আপনাকে ফেরেশ্তার ঊর্ধ্বে রাখবো। ইন্শাল্লাহ। আগামীকাল একবার সময় করে আমার গরীবখানায় আসলে বাকি আলাপ হবে।

বদরুদ্দিন সহাস্যবদনে উঠে দাঁড়িয়ে পূরণ-করা ফরম পকেটে পুরলেন। কাজী আবুল ফজল দরজা পর্যন্ত এসে বদরুদ্দিনকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

শনিবার সকালে ও রবিবার বিকেলে চেয়ারম্যান কাজী ফজল আসেন ট্রি টপ স্ট্রিটে, ইসলামিক সেন্টারের অস্থায়ী অফিসে। জনকল্যাণ কার্যকলাপ তদারক করাই তার আসার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রবাসি বাঙালির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও সাহায্য প্রদান এর অঙ্গ– ইকামট্যাক্স, ইনস্যুরেন্স, ইমগ্রেশন, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নানা ব্যাপার। তাছাড়াও মাঝেমধ্যে নিজেদের ঝগড়াবিবাদ মীমাংসার সালিশ করতে; এর মধ্যে প্রাধান্য পায় মেয়েছেলে ঘটিত অবাঞ্ছিত ঘটনা, আর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ; যেমন আজ। তাজুল ইসলাম অভিযোগ তুললেন; পর্বত্যপুরের চেয়ারম্যানের বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। দেশে মা ছিলেন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, আর সে ছিল বিলেতে। মায়ের শেষ দর্শন ইচ্ছুক সন্তানের অশ্রুসজল সানুনয় অনুরোধে দরদী তাজুল ইসলাম দিয়েছিলেন দু-শ পাউন্ডের একটা চেক; এ-শর্তে– দেশে পৌঁছে সে দশহাজার টাকা সমজিয়ে দেবে তার পাশের গ্রামে বসাসকারী তাজুল ইসলামের ছোট ভাইকে; কিন্তু কয়েক বছর গত হওয়া সত্যেও ধূর্তলোকটা কথা রক্ষা করেনি।

এ কাহিনী শোনে সৈয়দ সঞ্জব আলী শুধালেন, এ কেমনতর চৌধুরী? মিথ্যা বলে অন্যের টাকা লুটে খায়?

সোনা মিয়া বললেন, সে যে চৌধুরী বংশের ছেলে এতে কোনো সন্দেহ নেই!

সৈয়দ সঞ্জব আলী বললেন, বৃক্ষের ফলেই তার পরিচয় দেয়! দশ হাজার টাকা, ছলনা করে আত্মসাৎ! মাকে সরকাতে রেখে টাকার আত্মসাৎ! এ গুণের মধ্যে আমি চৌধুরীর সুনামের কোনো লক্ষণ দেখছি না।

কাজী বললেন, আমাদের আলোচ্যবিষয় হচ্ছে ইসলাম সাবের টাকা উদ্ধারপন্থা নির্ধারণ করা। চৌধুরীর হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করা না।

সেক্রেটারি বললেন, হাই-কমিশনের সাহায্যে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চেয়ারম্যান বললেন, তাহলে আপনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করুণ।

এমনিভাবে কাজীর অবসরের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় জনহিতকর কাজে; আর এতে মসজিদ কমিটির সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। বাঙালি হাতেনাতে ফল পেতে চায়; বাঙালি আজব মানুষ। যে-মৌলভী পানিপড়া জানেন না সে-মৌলভী যত ভালোই আলেম হয় না কেন তাকে পাড়ার মানুষ চিনতে চায় না। পানিপড়া মাওলানার চেয়ে পীরের কদর আরও বেশি। তজ্জন্য আজকাল যে মাওলানার নামের সঙ্গে 'পীরে কামিল' শব্দদ্বয় যোগ হচ্ছে। আর যারা করতে পারছে তারা বিলেত ঘুরে বিরাট বাড়ি খরিদ করতে সক্ষম হচ্ছে জেলা সদরে।

মসজিদ কমিটির অস্থায়ী অফিসে আগত চিঠিপত্রের উত্তর লিখতে কাজীর দাওয়াত পড়ল বদরুদ্দিনের বাড়িতে। শনিবার বা রবিবার না, ঠিক সোমবার বিকেলে, সাড়ে পাঁচটায়। অস্থায়ী অফিসে পৌঁছে দেখেন দরজার সামনে বদরুদ্দিনের ছোট ছেলে, সিঁড়িতে পা দুটো ছড়িয়ে, মাথা নত করে যন্ত্র দিয়ে আনারসের শূন্য টিনে ছিদ্র করে চলেছে– একের পর এক; খেলনা তৈরির উদ্দেশ্য।

কাজী সামনে দাঁড়াতেই ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, আব্বা ঘরেই আছেন।

খোলা দরজাপথে ভেতরে এলেন কাজী, দেখলেন অফিসরুমে বদরুদ্দিন চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। সামনে নতুন কেনা একটা টাইপ রাইটার। গভীর মনোযোগ সহকারে কসরৎ করছেন।

চেয়ারম্যানকে একেবারে সামনে দেখে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন বসার জন্যে। কুশলসংবাদ জেনে হাঁক ছাড়লেন, বরকত, দু-কাপ চা। এক কাপ চিনি ছাড়া।

– দুধ নাই আব্বা।

একটু জোরেই ছেলেকে ডকলেন। বললেন, এখানে এসো।

ছেলে কাছে এল; চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার মেজাজ ভাল নেই। মুখ গম্ভীর। একটা পঞ্চাশ পেনি পকেট থেকে বের করে বদরুদ্দিন তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, যা, এক বোতল দুধ নিয়ে আয়। বেশি দূর যাস্‌নে।

– আমার দশটা পেনি আব্বা।

– না, না। দুধ নিয়ে আয়।

– আমি রাখমু দশ পেনি। আমার কাম আছে।

– কিতা কাম, মেশিনে খাইত?

দস্তুর মতো রেগে গেলেন বদরুদ্দিন। ছেলের ভাষা অনুকরণ করে এ কথাগুলো বললেন; ছেলেকে নিরস্ত করার জন্য হয়ত, নতুবা বদরুদ্দিনের তো হরহামেসা মধ্যবঙ্গ পাশ করার প্রমাণে কোশীশ।

বদরুদ্দিনের ছেলেটা একটু চঞ্চল প্রকৃতির। ইতিমধ্যেই বাপের কাঁধ ছাড়িয়ে প্রায় মাথা ছুঁই ছুঁই। হাঁটে লম্বা লম্বা পায়ে; হাঁটার মধ্যে আবার জামেকান স্টাইল আছে, মনে হয় সব সময় দৌঁড়াচ্ছে। কাজী চোখ ঘুরাতে না-ঘুরাতেই ছেলেটা বসার-ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল। পাশের রুমে মায়ের ধমকে ছেলে কী বলল, বোঝা গেল না; কিন্তু ভদ্রমহিলার কথাগুলোকেমন যেন উত্তেজনায় আর চাপা লজ্জায় ঘরের বাতাসকে কাঁপাতে থাকে।

বদরুদ্দিন নিজের মাথাটা সামনের দিকে নুইয়ে হেসে ফেললেন। পশ্চিমের এক টুকরো রোদ জানালাপথে এসে বদরুদ্দিনের ওপর গুটিয়ে বসেছে; সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ছেলের কাণ্ড ঢাকার জন্য স্বাভাবিক হতে চাচ্ছেন; তাই হয়ত কাজীর দিকে মুখ তুলে, সঙ্কোচটা একটু কাটানোর জন্য বললেন, সৈয়দ সঞ্জব আলীর অভিযোগ, তার বাসায় কোথাকার শ্বেতাঙ্গ ছেলেরা হামলা চালাচ্ছে দিন-দুপুরে। দরজায় থাবা দেয়। দরজার পিটে তাল তুলে। লেটারবক্স দিয়ে যতসব আর্জনা আছে সব ঘরের ভেতর ঢেলে দেয়।

কাজী দেখলেন ছেলেটা ফিরে এসে কপাটের ধারে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে বাবাকে দেখছে। মা দ্রুত পায়ে খাবার-ঘরের দিক থেকে এসে ছেলের পেছন দাঁড়ালেন। কাজীর চোখে শুধু একটা আটপৌরে শাড়ির অংশটা পড়ল। পর্দাটা তুলে দিতেই ছেলে চা নিয়ে বসার-ঘরে প্রবেশ করল। বদরুদ্দিন কিন্তু বলেই চলেছেন, এসব ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য পল ও পাকিস্তানির সহযোগে বর্ণবিরোধী সমিতি স্থাপন করার জন্য উৎসাহিত করছেন প্রতিবেশীদেরকে। কিন্তু, মূল কারণ হচ্ছে অন্য বিষয়। আপনি কি জানেন কী?

ছেলেটা আড়চোখে কাজীকে দেখে নিয়ে বলল, আপনার চা। চিনি ছাড়া। অন্য কাপটা বাপের সামনে রেখে কিছু না বলেই ঘর ছেড়ে চলে গেল। বদরুদ্দিন একটু দম নিয়ে নিজ প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন করা।

– কি রকম?

– বশর আলী আমাদের এসিসটেন্ট সেক্রেটারি, তলে তলে সলতা যোগাচ্ছে, তৈলাক্ত করছে। শিয়ালের চালাকি কি-না তা-ই! চাপ দিয়ে তাপ সৃষ্টি। আমাকে কাবু করা। ব-কলম ব্যাটা সেক্রেটারি হওয়ার কত সখ! তাই তো ব্যারিস্টারকে পকেট খরচ দিচ্ছে তার কাজ করার জন্যে; তবু যাতে সেক্রেটারিগিরী না যায়।

– উপযুক্ত সেক্রেটারি হোসেন সাব থাকাবস্থায় আমাদের অন্যব্যবস্থা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

– এখানেই তো বেঁধেছে গোল। হোসেনসাব বাংলাদেশ এসোয়িশনের প্রতি ঝোঁকে পড়েছেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার্থে তাকে সরিয়ে ফেলা এখনই উচিত।

চোখ বুজে সোফায় হেলান দিয়ে কাজী ভাবলেন, মানুষ অকারণেই বিষণ্ন হয়, দুঃখ পায়। মনে হয় মানুষের স্বভাবই এমনি। কৌতূহলী চোখ খুলে তাকালেন বদরুদ্দিনের দিকে। বললেন, এমন কি করেছেন যে, তার ওপর আপনার এত অনাস্থা?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। প্রকৃতি এখনও অন্ধকারে ডুবে যায়নি। গ্রীষ্মকালে বিলেতে অন্ধকার নামে দেরিতে। রাস্তায় এখনও লাইট জ্বালানো হয়নি। কাজী জানালার পর্দার ফাঁকে স্থিরচোখে করে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বদরুদ্দিন বললেন, গ্রীষ্মের স্কুল ছুটিতে ছোটদের খেলার আয়োজনে মসজিদ কমিটির ভূমিকা অনৈসলামিক বলে প্রচার করছেন তিনি। তার প্রধান কারণ তিনি এখন বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আশা তার আর্থিক উন্নতি।

কাজী শুধু ঘাড় নাড়ালেন, যেন বাধ্য হয়ে বদরুদ্দিনের কথার জবাব দিতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, কিন্তু তাকে সরানো তো সহজ না। তাছাড়া সময় সাপেক্ষ তো বটেই! তিনি সাধারণ সভায় সধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত সেক্রেটারি। বৎসর শেষে এ-সভা আবার নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যরাই ঠিক করবে কে থাকবেন আর কে যাবেন। তার আগে তাকে সরানো সম্ভব উচিত না। মনে রাখবেন যে-কোনো সংস্থার বিকাশের দুটো ধারণা রয়েছে– হ্রাস ও বৃদ্ধি রূপে বিকাশ, আর বিপরীতের একত্বরূপে বিকাশ।

কাজীর শেষের কথাগুলো না-শুনে খুঁজে খুঁজে একটা পান বের করে খিলি বানাতে লাগলেন বদরুদ্দিন। দেয়াল ঘড়িটা যেন আপন মনে টিকটিক করে উঠল। বদরুদ্দিন ঘড়ির কাঁটার দিকে না তাকিয়েই বললেন, তা হলে উপায়?

– একমাত্র, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ।

– আমি সে ব্যবস্থাই করবো।

কথাটা শুনতেই কাজীর শরীর শিউরে উঠল। শরীরের ওপর তো কারও হাত নেই। বললেন, কিভাবে?

– তার স্ত্রী বেপর্দা, বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা করেন; এর প্রতিবাদে প্রচুর বাদানুবাদ চলছে, এর ফলশ্রুতিতে হোসেনসাবের পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

বদরুদ্দিনের কথা শুনে অন্তরের ভেতর কাজী শিউরে উঠলেন। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, মাথাটা টলমল করে উঠল। চোখ বুজে এ তীব্র যন্ত্রণাকে সহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করতে চাইলেন। বদরুদ্দিন বলে চললেন, বশর আলীর কুৎসিত স্বপ্নকে ভাঙতে কতক্ষণ, সৈয়দ সঞ্জব আলীর যোগসাজশে ও ব্যারিস্টারের সাহায্যে। আমি সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবো । ব্যাটারা ঠাকুর চেনেনি!

নেকড়েবাঘ ছাগলছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বমহূর্তের রূপ ও ছাপ প্রকাশ পেল বদরুদ্দিনের চোখেমুখে, সারা বদনে। স্বাভাবিক স্বরূপ আনয়ন করার উদ্দেশ্যে কাজী সহজভাবে শুধালেন, ব্যারিস্টারের পশার কেমন?

তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন বদরুদ্দিন, বোম্বে ব্যারিস্টারের আবার পশার? পেশা থাকলে তো পশার? পরের পকেটের সিগারেট ফুঁকে বেড়াচ্ছে, বশর আলীর বাসায় উদর পুর্তির আশায় ঘন ঘন আনাগোনা, খেতে পেলে হাসির চলে ফুলুরি, পরের সোনায় পোদ্দারী। দাঁতে দাঁত কিড়িমিড়ি খেলেন বদরুদ্দিন। কাজী শব্দহীন হাসি হাসলেন। তারই ফাঁকে বদরুদ্দিনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন সন্ধান করলেন; তবে তার বক্তব্যের কোনো

জবাব নিলেন না। বদরুদ্দিন বলেই যেতে থাকেন, মুর্খের কাছে মাতব্বরী, বউয়ের সঙ্গে কুদুম্বুরী, দম্ভ প্রকাশ, বলে কী না কুইনের মেহমান।

এক নিশ্বাসে কথা কটা বলে আরেকটা সিগারট পুরলেন ঠোঁটের ফাঁকে। এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিন তিনটা সিগারেট ছাই হল। এ লক্ষ্য করে কাজী বললেন, আপনার সিগারেট খাওয়া কমানো প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। মস্ক ও ইসলামিক সেন্টারের জন্যে যেভাবে রাতদিন ভাবছেন তার সিকিভাগও চিন্তা করছেন না নিজ মসজিদরূপ শরীরের জন্যে।

– দেখুন চেয়ারম্যান সাব, চায়ের সঙ্গে সিগারেট বড্ড তৃতিপ্তদায়ক। শ্রান্তিনাশক। আর চা খাওয়ার পর এক খিলি পান– চুন ও সাদা পাতার সঙ্গে এলাচি, লবঙ্গ মিশিয়ে মুখে পুরলে রসস্বাদন। রসের সঙ্গে মিলিয়ে দেন ধীরে ধীরে একটা দামী সিগারেটের ধোঁয়া। আহা কী আরাম!

মুচকি হেসে আরাম উপভোগ করতে লাগলেন বদরুদ্দিন।

– সব স্বাদের জিনিস শরীরের পক্ষে সহনীয় যে না, এ আমাদের বোঝা উচিত।

– শরীরের প্রতি অযথা মনোযোগ দিয়ে করবেনই-বা কী? মৃত্যুর নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ধার্য করা আছে। এর ব্যতিক্রম করতে কেউ পারবে না। আজরাইলের ভুলেও না। যথাসময় এসে হাজিরা দেবেনই। সৃষ্টির পূর্বে আয়ুস্কাল নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে; এ ঘড়ির কাঁটার নড়চড় নরের সাধ্যাতীত।

লন্ডনের এ শীর্ষগলির একটা দেড়খানা ঘরে বাস করতে করতে বদরুদ্দিনের নিজ অস্তিতেই অবিশ্বাস এসে গেছে। তাই হঠাৎ বলে বসলেন, আপি কী তা বিশ্বাস করেন না?

এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কাজী আবুল ফজল। থতোমতো খেয়ে গেলেন। ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঈমান-আমান নিয়ে এর আগে কেউ এরকম প্রশ্ন করেনি। বদরুদ্দিনের ছেলে একহাতে সন্ধ্যার জলখাবার আর অন্যহাতে একটা পানির গ্লাস নিয়ে বসার-ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর দুটো জিনিস নামিয়ে বাপের কাছে গিয়ে আদরের গলায় বলল, আম্মা পাঠাইছন।

– আরেক গ্লাস পানি দিয়ে যাস্।

কাজী এরই মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে সহজভাবে স্মিতমুখে বললেন, এমন দুঃসাহস আমার নেই, তবে ভবিষ্যতে কারও যে হবে না এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া তার ইচ্ছা; কিন্তু সবটা মন এতে সায় দিচ্ছে না। মনের সেই অংশটাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, প্রত্যক্ষদর্শী, সত্যাগ্রাহী একজন সাহসী তো বলতে পারে– স্রষ্টা লিখে রেখেছেন তারিখটা, কারণ তিনি ভবিষ্যত দ্রষ্টা। কিন্তু অনেকে তো এ মানেন না; তারা বলেন, 'আল্লাহ যদি সব কিছুর নিয়ন্তা হয়ে থাকেন তবে আমরা কেন অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাই।' আপনিও তো হার্টের রোগের জন্য ওষুধ খাচ্ছেন। তাহলে কি আপনি স্বীকার করছেন না– আল্লাহ সব কিছুর নিয়ন্তা নন। আর যদি একে অস্বীকার করতেন তবে চিকিৎসাশাস্ত্রকে অস্বীকার করতেন। সাম্পান-ক্রসে মসজিদ গড়ার জন্য সরকারে কাছে হাত পাতেন না। রোগমুক্তির জন্য বা মসজিদ গড়ার ব্যাপারের আল্লাহর বিশ্বাসের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে সততা দেখাতেন। যাকগে, আমার উচিত চেষ্টা করে যাওয়া– বাঙালি যুবক-যুবতী যেন সদজ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। তাহলে এক সময় তারা এর সদ্ব্যবহার করতে পারে।

ফোন বেজে উঠল। কাজীর বাড়ি থেকে আসা। ওভারকোট হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন কাজী।

বদরুদ্দিন কিছুই বললেন না।

(চলবে...)